২৪-০৬-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মাতেশ্বরী জীর স্মৃতি দিবসে শোনানোর জন্য বিশেষ মহাবাক্য"

"এই দুঃখের দুনিয়ায় কোনো আশা রেখো না, সুখের দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য নিজের সংস্কার দৈব বানাতে হবে ।"

গীত :- কেউ আমাকে নিজের বানিয়ে হাসতে শিখিয়ে দিয়েছে .....

এক হলো হাসির দুনিয়া আর এক হলো কান্নার দুনিয়া .....এখন কোথায় বসে আছো ? কান্নার দুনিয়ার এখন অন্তিম কাল আর হাসির দুনিয়া বা সুখের দুনিয়ার এখন চারা লাগানো হচ্ছে। এখন আমরা সঙ্গম যুগে আছি কিন্তু সেই সুখের দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি, তাই আমাদের সম্পূর্ণ নজর তার উপরই আছে । এখন এই কান্না বা দুঃখের দুনিয়া থেকে কোনরকম ধন - সম্পত্তি, পদমর্যাদা বা মান - সম্মানের আশা করা উচিত নয় । কেননা এখন সবকিছুতেই যেমন ধন - সম্পত্তিতেও সেই কান্না অর্থাত্ দুঃখই লেগে আছে । এই দুনিয়ার যে কোনো প্রাপ্তি, যাকে প্রাপ্তি মনে করা হয়, তাতে এখন আর কোনো সুখ নেই । এই কারণেই বাবা বলেন, আমি যেই হাসির অর্থাত্ সদা সুখের দুনিয়া বানাচ্ছি , সেখানে যাওয়ার জন্য নিজের সংস্কার এমনই বানাও । দেখো, চিত্রকারেরাও দেবতাদের মূর্তি বা ছবিতে কেমন হাসি দিয়ে বানান, তাদের চেহারাতেও পবিত্রতা আর দিব্যতা দেখানো হয় । তাই এখন আমরা সেই সংস্কার তৈরী করছি বা ধারণ করছি, যেখানে কোনো দুঃখের চিহ্নই থাকবে না । সেখানে কোনো কান্নাকাটি থাকে না, তাই বাবা বলেন, এতকাল অনেক কেঁদেছো,অনেক দুঃখ পেয়েছো অর্থাত্ দুঃখের দুনিয়ার অনেক জন্ম ভোগ করেছো । এখন সেই রাত পূর্ণ হয়ে দিন তো আসবেই, তাই না ? তাই এই রাত অথবা দুঃখের যে জেনারেশন তা এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন সুখের জেনারেশন শুরু হবে । তাই সেই সুখের দুনিয়ার ভিত এখানেই স্থাপন করতে হবে, তাই খুব খেয়াল রাখতে হবে । এখন যদি ভিত তৈরী হয় তো ভালো না হলে সর্বদার জন্য সুখ প্রাপ্ত করা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে । যে গায়ন আছে যে মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, সে কোন জন্মের কথা বলা হয়েছে ? সে এই জন্মের জন্য, কেননা এমন জন্ম তো অনেকেই আছে কিন্তু সবথেকে মহত্বপূর্ণ জন্ম এটাই কারণ এখনই আমরা উঁচু জেনারেশনের ভিত স্থাপন করছি ।

কেউ কেউ ভাবে যে ৮৪ লাখ যোনিতে ঘোরার পর এই মনুষ্য জন্ম হয়, তাই এই মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, তারা ভাবে এই ৮৪ লাখ যোনির পরই এক সুখের জন্ম পাওয়া যায় । এমন যদি হয় তাহলে সকল মানুষেরই সুখী হওয়া উচিত, তাহলে মানুষ কেন এতো দুঃখ ভোগ করে ? মানুষের তো এই মনুষ্য জন্মেই নিজের জন্মের দুঃখ বা সুখ বা কর্মের যা হিসেব নিকেশ আছে, তা ভোগ করতে হবে । বাকি এমন নয় যে মানুষ জন্তু, পশু, পাখি, বৃক্ষ ইত্যাদি জন্মে আসে । এ তো এখন সকলের বুদ্ধিতে আছে যে মানুষকে তার কর্মের হিসাব মনুষ্য জন্মেই পেতে হবে । আর এও তোমরা জানো যে মানুষ অধিকতর ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে । বাকি যারা পিছনের দিকে থাকে তাদের কম জন্ম হয়ে থাকে । তাহলে এই সব হিসাব এখন বুদ্ধিতে আছে, সেই হিসাব অনুসারে আমরা জানি যে এখন আমাদের অন্তিম জন্ম চলছে যেই জন্মে এখন আমরা নতুন জেনারেশন অথবা সুখের অনেক জন্মের যে প্রালব্ধ, তা বানাতে পারি তাই এই জন্মের মহিমা হলো এই জন্ম সবথেকে উত্তম কেননা এই জন্মে আমরা উত্তম হতে পারি । তাই এই জন্মকে খুব খেয়াল আর নজরে রাখতে হবে । এখনই সেই সময়,

যেই সময় পরমাত্মা এসে আমাদের উচ্চ বানানোর জন্য বল প্রদান করছেন । তাহলে এখন যখন তাঁর থেকে সেই বল পাচ্ছো তখন তা নিতেই হবে । এমন নয় যে এই জন্মেই আমরা নিজেরাই উচ্চ হতে পারবো । না, যিনি বানাবেন তিনি যখন এসেছেন, তখন তাঁর দ্বারাই নিজেকে উঁচু বানাতে হবে । কিন্তু কিভাবে হতে হবে ? তাঁর যা আদেশ বা আজ্ঞা অথবা মত আমরা পাচ্ছি, সেই মতকে ধারণ করে । এখন তাঁর মত বা নির্দেশ কি তা তো খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে আছে, তাই না ? "বি হোলি এন্ড বি যোগী ।" আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো । তাই এই কথাকে খুব ভালোভাবে নিজের বুদ্ধিতে রেখে তাঁর আদেশ মতোই নিজেকে চালাতে হবে তখনই নিজের যে সৌভাগ্য হবে তা তোমাকে উঁচু বানাতে সক্ষম হবে অথবা সেই সদা সুখের দুনিয়ার সুখ পেতে পারবে । এমন তো কখনো ভাবো না যে, এ হলো কল্পনা, এমন খেয়াল তো আসে না তোমাদের ? কল্পনা কেন মনে করবে ? যখন দেখছো এ হলো দুঃখের দুনিয়া । এ তো কল্পনা নয় , এ হলো প্র্যাকটিক্যাল । তাহলে অবশ্যই সুখের দুনিয়াও প্র্যাকটিক্যাল হওয়া চাই । যা এখন নেই কিন্তু হওয়া তো উচিত, তাই না ? এমন তো নয় যে এই সংসার সর্বদা দুঃখের জন্যই ? এখানে সুখ আর দুঃখ দুটোই আছে, কিন্তু সুখের সময়ও নির্ধারিত আছে । এমন কখনোই বলবে না যে এখন যে সুখ আছে এই সুখই সুখ, এই হলো স্বর্গ । এমনই সুখ আর দুঃখই থাকবে, কিন্তু না । এখনকার সুখকে সুখই বলবে না, সেই সুখ যা ছিলো, যাতে আমরা সদা সুখী ছিলাম, সে জিনিসই অন্য তাই তাকেই সুখ বলবে । আজ আমরা কল্পনা কেন বলি ? কেননা আজ তা থাকে না । কিন্তু নিজের বিবেক আর এই জ্ঞানের বলের দ্বারা বুঝতে পারো যে, যখন দুঃখের দুনিয়া আছে তখন অবশ্যই সুখের দুনিয়া হওয়া উচিত । কেউ এমন পথও দেখায় যে যদি দুঃখ আসে কিন্তু তুমি ভাবো যে আমি সুখী, এই কারণে কেউ ভাবে যে সুখের কোনো ইচ্ছা বা আশা রাখা উচিত নয়, এতে ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা হতে হবে । সুখের ইচ্ছা কেন রাখবে, যা হবে তাতেই সুখ খুঁজে নাও । যদিও কোনো রোগ হয় বা অকালমৃত্যু আসে বা যাই হোক না কেন, তোমরা নিজেদের সুখী ভাবো । এ তো হলো নিজের কল্পনার সুখ, একে কি কখনো প্র্যাকটিকাল বলা যায় ? যেমন দুঃখ প্র্যাকটিক্যাল, কোনো দুঃখের কথা প্র্যাকটিক্যালে আসে । এমন ভাবে সুখও প্র্যাকটিক্যালে আসা উচিত । তাই সঠিক সময় মতো সেই সুখের দুনিয়া আসা চাই, কিন্তু তার ভিত এখনই স্থাপিত হচ্ছে। তারজন্য আমাদের নিজেদের কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে, কেননা এ হলো কর্মক্ষেত্র, কর্মভূমি, এখানে যা বপন করবে তাই পাবে, এই হলো এর নিয়ম । বাবা বলেন যে আমি তো এই নিয়ম ভাঙ্গতে পারবো না । যদিও তুমি এই পৃথিবীর সর্বময় কর্তা কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমি চাইলে আকাশকে নামিয়ে আনতে পারি, ধরিত্রীকে উপরে তুলতে পারি । মানুষ ভাবে যে ভগবান তো যা খুশী করতে পারে , তিনি মৃত মানুষকেও বাঁচিয়ে দিতে পারেন । কিন্তু ভগবান বা শক্তির অর্থ এই নয় যে তিনি মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন । এ তো আত্মার শরীর ত্যাগের কথা, অন্য কোনো বিষয় নয় । যদি তাকে বাঁচিয়ে দিই, তাহলে সে কি আর মারা যাবে না ? আবারও তো সে মারা যাবে । তাহলে প্রতিটা জিনিস যে নিয়ম অনুসারে চলে, সেভাবেই তো চলবে, তাই এতে কোনো শক্তি দেখানোর কথা নেই ।

এই যে পাঁচ তত্ব আছে, এই পাঁচ তত্বেরও নিজের নিজের নিয়ম আছে, তারাও গোল্ডেন, সিলভার, কপার আর আয়রন এজ অনুসারে নিজের স্টেজে আসে । এই যে ভূমিকম্প, বন্যা বা তুফান আসে, এ সবই হবে, এও এখন নিয়ম ছাড়া, সব তমোপ্রধান হয়ে গেছে, সমস্ত জিনিসেই এখন তমোপ্রধানতা । এই সমস্ত রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন যে এখন সমস্ত জিনিস খারাপ হয়ে গেছে, এখন যখন আমি এসেছি, তখন সব জিনিসকেই পাল্টে দিই, তাই এর জন্য আগে মনুষ্য আত্মাকে পাল্টাই, তাতেই সব

জিনিস পাল্টে যায় । এই সংসারই যখন এইভাবে বদলে যায় তখন তাতে সদা সুখই সুখ, তখনই একে অপরকে আর দুঃখই দেয় না । এখন সব জিনিস থেকেই মানুষ দুঃখ পায়, তাই এই বিষয়কে ঠিক ভাবে বোঝা,আর কিভাবে এই সৃষ্টি চক্র বা সংসার চলছে, তাকে জানা – এর নামই হলো জ্ঞান । এই জ্ঞানেই আমি পূর্ণ, আমার কাছেই এর জ্ঞানের সম্পূর্ণতা আছে, এই কর্মের খাতা কিভাবে চলে,কেমন ভাবে তা ক্রম অনুসারে আসে, এই সব কথাই আমি জানি, তাই বলা হয় যে এই জ্ঞানকে কোনো মানুষই যথার্থ ভাবে বুঝতে পারে না, কারণ এই মানুষ সবাই এই চক্রতেই আসে । তাই যারা এই চক্রতে আসে তারা এই কথাকে জানতে পারে না, আর যিনি এই চক্রের বাইরে, তাঁর কাছেই এই সৃষ্টির সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে । তাই বাবা বলেন যে আমি এসেই আবার নতুন করে শোনাই, কারণ একমাত্র আমিই এই জ্ঞান সম্পর্কে জানি, আর সকলেই তা ভুলে যায় । তাই সবাইকে আমিই শক্তি প্রদান করি, আমার মধ্যেই সেই শক্তি আছে, আর সকলেই এই জন্ম – মরণ চক্রে এসে শক্তিহীন হয়ে যায় । তাই আমি আসি আমার শক্তি তোমাদের দেওয়ার জন্য । এ তো খুবই সহজ কথা, এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো বিষয়ই নেই । এইজন্যই আমাকে পরম আত্মা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, জ্ঞানের সাগর .....ইত্যাদি বলে মহিমা করা হয় । আমার মহিমা এমনিতে করে না, আমি কাজ করেছি,আর আমার কিছু কর্তব্যও আছে,আমি অনেক বড় কাজ করেছি, তাই আমার মহিমা । যেমন মানুষের কেন মহিমা করা হয় ? গান্ধীর জন্য বলা হয় যে তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন, উঁচু মানুষও ছিলেন । তাঁকে উঁচু মানা হয়েছিলো এই কারণে নয় যে তিনি বড় ছিলেন । এমনি তো বড় ছিলেন না, বড় অর্থাত্ কর্তব্যে বড় । তিনি খুব ভালো কাজ করেছিলেন, তাই সবাই তাঁকে স্মরণ করে, তাঁর মহিমাও করে । তাই মানুষ যে ইতিহাস পড়ে তাতে লেখা থাকে যে অমুকে এই ভালো কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে তাঁর গায়ন হয়ে থাকে । তাই পরমাত্মারও যে এই মহিমা করা হয়, তিনি অবশ্যই কোনো ভালো কাজ করেছিলেন, তাই না ? বাকি এমন তো নয়ই যে তিনি উপরে বসে আছেন, তাঁর শক্তি কাজ করে বা এইসব কাজ হতেই থাকে । তিনি এসে অবশ্যই কিছু করেছিলেন । মানুষকে তিনি এত উঁচুতে উঠিয়েছিলেন, আর এমন পদ্ধতিতে উঠিয়েছিলেন, তাই তাঁর এত মহিমা । তাই এখন তোমাদের পরমাত্মার এই মহিমা আর তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে মানুষকে বোঝাতে হবে । যেমন ধর্মপিতারাও যারা আসেন, তাদেরও মহিমা করা হয় । গুরু নানক, ক্রাইস্ট, বুদ্ধ, এনারা সকলেই তাঁর দিকেই ইশারা করেছিলেন । তাই এইসব হলো পরিষ্কার কথা , যা বুঝে পুরুষার্থ করতে হবে, আর বাবা যে আদেশ দেন যে, আমাকে স্মরণ করো, নিজের কর্মকে শ্রেষ্ঠ আর পবিত্র রাখো, আর এর দ্বারাই তোমাদের জীবনের যে অধিকার তা তোমরা প্রাপ্ত করবে । তোমরা এমন কর্ম তো করতেই থাকো কিন্তু তোমাদের সেই কর্মও ভুল হয়ে যায় আর এর ফলেই তোমাদের দুঃখ বাড়তে থাকে তাই বাবা বলেন, এখন সব বুঝে করো, আমি যে বুদ্ধি প্রদান করি, তা নিয়ে খুব ভালোভাবে কাজ করো, আমার নির্দেশিত পথে থাকো । আমার মতে চললে তোমাদের যা কাজ বা আচরণ, সব ঠিক হবে, আর সেই আধারেই তোমরা সুখী থাকতে পারবে । নিজের কাজের ভূমিকাতেই তো ভালো বা খারাপ হয় । তাকে আমরা কি করবো, কেমন করবো, তার তার বুদ্ধি আমাদের থাকা চাই, সেই জ্ঞান এখন বাবাই দিয়ে থাকেন, সেই জ্ঞানেই এখন আমাদের চলতে হবে । এই কথা বুঝেই নিজেদের তেমনই পুরুষার্থ করতে হবে । আচ্ছা ।

দেখো, এ কতো সাধারণ এবং সহজ কথা, এরজন্য মানুষ কতো বেদ – শাস্ত্র, গ্রন্থ, পুরাণ আর কতো প্রকারের হঠযোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে থাকে । বাবা এইসব কথা খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেন । কর্ম করেই তো চলতে হবে কিন্তু সেই কর্মকে সঠিকভাবে করো । কিভাবে এই কর্মকে পরিবর্তন

করবে ? তা তিনিই বুঝিয়ে বলেন । এরজন্য তোমাদের কোনো বিদ্বান, পণ্ডিত বা আচার্য হওয়ার প্রয়োজন নেই । তোমাদের নিজের কর্মে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে । স্বচ্ছতা (পবিত্রতা) কি, তাও তিনি বসে বোঝান যে তোমরা আমার স্মরণ ছাড়া পবিত্র হতে পারবে না । যতই তোমরা কোনো দেবতাকে স্মরণ করো না কেন । অন্য কারোর সাথে যোগ করলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে না । এই পাপকে দগ্ধ করার শক্তি একমাত্র আমার কাছেই আছে, এইজন্যই বাবা বলেন, যতক্ষণ না আমার সাথে যোগ করবে, ততক্ষণ পবিত্র হতে পারবে না । যেমন কোনো বাতির যোগ মেন পাওয়ার হাউসের সঙ্গেই থাকে । যদি সেখান থেকে যোগ না হয় তাহলে সেই বাতিতে আলো জ্বলে না । সেই শক্তি আসবেই না । এইভাবেই তোমাদের যোগও আমার সাথে, আমিই হলাম মেন পাওয়ার হাউস তাই আমার সাথেই যোগ লাগাতে হবে । যদি আমার সাথে যোগ না হয় তাহলে তোমরা শক্তি পাবে না, আর এই শক্তি না পেলে পাপও দগ্ধ হবে না । আর পাপ দগ্ধ না হলে তোমরা এগোতে পারবে না, তাই বলা হয় এক আমার সাথেই যোগ লাগাও । আমি ছাড়া তোমাদের গতি বা সদ্গতি হতে পারে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । ওম্ শান্তি ।

বরদান :- নিজের চেহারা আর চলনে সত্যতার সভ্যতা অনুভব করিয়ে মহান আত্মা হও ।

সে-ই মহান আত্মা যাঁর মধ্যে সত্যতার শক্তি আছে । কিন্তু এই সত্যতার সঙ্গে অবশ্যই সভ্যতা চাই । এমন সত্যতার সভ্যতা সম্পন্ন মহান আত্মাদের বচন, নজর, চলন, খাওয়া - দাওয়া, ওঠা - বসা, প্রতি কর্মে সত্যতা স্বত: নজরে আসবে । যদি সভ্যতা না থাকে তাহলে সত্যতাও থাকবে না । এই সত্যতা কখনোই সিদ্ধ করে দেখানো যায় না । সত্যতা তো নিজেই সিদ্ধ, তাই সিদ্ধিপ্রাপ্ত । সত্যতার সূর্যকে কেউই লুকোতে পারে না ।

স্লোগান :- নম্রতাকে যদি নিজের কবচ বানাতে পারো তাহলে সদা সুরক্ষিত থাকবে ।